সেকালের থিয়েটারি গিমিক

অপূর্ব দে

ইদানিং নাট্যমহলে কান পাতলেই শোনা যায় ‘‘গিমিক নিয়ে দর্শক মনোরঞ্জনের চেষ্টা হচ্ছে’’ কিংবা ‘‘গিমিক দিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না। ’’ প্রশ্ন হল ‘গিমিক’ কাকে বলে? অক্সফোর্ড গিমিকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে -‘‘Trickly device, one adopted for the purpose of attracting attention or publicity.’’ The oxford companion to the theatre- এ ‘Gimmick’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে - “An outward show or ostentatious display of some a performance aiming to draw public attention. ’’ অর্থাৎ দর্শকের মনোরঞ্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য চাতুরি বা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। গিমিক বা থিয়েটারি চমক দেখে দর্শক চমকে উঠবে, তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া তার হবে

কিন্তু সে উদ্দীপ্ত হবে না। কারণ - দর্শকের চোখের তৃপ্তিবিধানই গিমিকের মূল লক্ষ্য। গিমিকের সাহায্যে দর্শকের চি মার্জিত ও উন্নত করার পরিবর্তে লাগামহীন প্রমোদপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ফলে সস্তা, তরল, মজা ও হৈ হুল্লোড়প্রিয় জিনিসের আমদানী করতে হয় থিয়েটারে। দর্শকের চিন্তা ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে যে নাটক , যার আবেদন দর্শকের বুদ্ধির কাছে, সে নাটকে বা থিয়েটারে গিমিক দেওয়ার অবকাশ নেই। শ্যামানন্দ জালান আয়োজত থার্ড থিয়েটারের কার্নিভালে ডেনমার্কের নাট্য বিশেষজ্ঞ ইউজিনিও বার্বা সগর্বে ফতোয়া দেন, রাজনৈতিক নাটক ফাটক কিছু না, গিমিক সর্বস্ব থিয়েটারই খাঁটি জিনিস। তিনি অবশ্য মার্শাল আর্টের কলাকৌশলে চোখ ধাধিঁয়ে দেবার তত্ত্বে বিশ্বাসী। গিমিকের চাপে সেক্ষেত্রে নাটকের বক্তব্য হারিয়ে গেলেও দোষের কিছু নেই। সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের চোখ ধাধাঁনোই মূল লক্ষ্য। অসি হাতে ভল্ট দিয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করছে অভিনেতা কিংবা বর্শা হাতে শিকারী নৃত্যের বিক্রম দেখাচ্ছে ; সঙ্গে চলছে লাল-নীল আলোর নানা কারিকুরি। দর্শক উল্লাসে ফেটে পরছে ঘন ঘন হাততালিতে উত্তেজনাকে প্রকাশ করছে। এককথায় পাবলিক খাচ্ছে। অভিনেতা হিসাবে আমি তৃপ্ত, পরিচালক হিসাবে আমি গর্বিত। দর্শকের মনের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিচ্ছি দর্শক-মন জাগানোর দায়িত্ব ভুলে গিয়ে। নাটকে এই ধরনের দৃশ্যের প্রয়োজন আছে কিনা - তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায় নেই। চির শাসন এ শৃঙ্খলার রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে তরল রসের আমদানি করে থিয়েটারকে আমোদাগারে পরিণত করার ঝোঁক থাকে গিমিক সর্বস্ব থিয়েটারে।

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে আমোদের প্রধান উপাদান ছিল সংগীত। সংগীত বাহুল্য সে সময়ে নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণে-অকারণে সংগীত ব্যবহার নাটকের গতিকে ব্যাহত করত। নাটকের প্রয়োজন সেখানে ছিল গৌণ, সংগীতের রসেই দর্শকদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল প্রধান। হেমন্ত কুমার রায় তাঁর ‘বাংলা রঙ্গালয় ও শিশির কুমার ’ গ্রন্থে এ-সম্পর্কে বলেছেন -- “গুগম্ভির সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকেও থাকত নিছক প্রহসনের উপযোগী নাচ গান।.....তা কেবল সুলভ ও নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গী সঙ্গীতকেই বলপূর্বক আমাদের শ্রবণ -বিবরে নিক্ষেপ করত না, সেই অসামরিক ও বিজাতীয় উপসর্গের জন্যেও প্রত্যেক অঙ্কের শেষে যবনিকা পড়লেই একেবারে জোলো হয়ে যেত নাটকের সমস্ত ঘনীভূত রস। কারণ মূল নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গে ছিল না তার কোন রকম সম্পর্কই ।” অর্থাৎ সে যুগে সংগীতই ছিল গিমিকের প্রধান বাহন। পাশাপাশি ছিল মঞ্চমায়া সৃষ্টির নানা কলা কৌশল। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ধর্মদাস সুর। যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র অলিম্পিক থিয়েটারে গিয়ে নৌকা ভাসান, আকাশে মানুষ অদৃশ্য করা, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, বৃষ্টি ইত্যাদি দেখাবার কৌশল শিখে এসেছিলেন। ১৮৭২ সালে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে ‘লীলাবতী’ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায়। এ নাটকে যোগেন্দ্রনাথ নানা দৃশ্যে ওই ধরণের চমক ব্যবহার করেছিলেন।

নাটকে গিমিক কিংবা নানা মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে চমক দিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু যুগের ঐতিহ্য - ধারাবাহী এক নবভাবনায় উদ্দীপিত নাট্যব্যক্তি হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাণ্ডের উদ্ধত স্পর্ধা, বেপরোয়া গতির নেশা এবং নিয়ম ও প্রথা ভাঙার অদম্য জেদ নিয়েই তিনি থিয়েটার জগতে প্রবেশ করলেন। পুরোনো নাট্যব্যক্তি যেমন গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু , মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখের বিরুদ্ধে যেন অঘোষিত যুদ্ধ করলেন। দর্শকের চিত্ত মার্জিত ও উন্নত করার পরিবর্তে তাদের কদর্য চি ও রসের সব আগল খুলে দিলেন। থিয়েটারকে তথাকথিত জনপ্রিয় করতে চটকদারী নাচ, গান, কৌতুক ও মজার ক্রিয়াকলাপের আমদানী করলেন। সস্তায় বাজিমাত করতে গিয়ে নানা চমকের জোগান দিলেন। জৌলুস, জাঁকজমক, বর্ণময়তা, আড়ম্বর এসবের মধ্যেই তিনি নজর দিলেন বেশি।

বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত স্টার থিয়েটার ১৮৮৭ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় এমারেল্ড থিয়েটার ‘ক্লাসিক’ থিয়েটারে রূপান্তরিত হয় ১৮৯৭ সালে। দর্শক আকর্ষণের জন্য তিনি ‘ক্লাসিক’ থিয়েটার’কে দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসজ্জার প্রয়োগের ব্যপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। চিরাচরিত অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর পরিবর্তে তিনি ‘ঠেলা সিন’, ‘কাটা সিন’, ‘বক্স সিন’ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। মঞ্চে নাটকের প্রয়োজনে বাস্তবানুগ পরিবেশ রচনার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম সত্যিকারের টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী ইত্যাদি ব্যবহার করেন। আলো ও মঞ্চ সমন্বয়ে তিনি মঞ্চে নিত্য নতুন অভিনব নাট্যদৃশ্যের মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করেন। অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চে ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, পাখি, পায়রা প্রভৃতি আমদানি করেছিলেন। নাট্যক্রিয়ার বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি ট্রেনের শব্দ, রিভলবারের আওয়াজ ইত্যাদি শব্দানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। আবার দৃশ্য বাস্তবতা আনার জন্য আগুন, ধূম-উদগীরণ ইত্যাদি মঞ্চে দেখিয়েছিলেন।

ক্লাসিকের প্রথম বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা ‘আলিবাবা’। সে সময়ে মিনার্ভায় ‘আলিবাবা’ অভিনীত হচ্ছিল। প্রতিযোগিতামূলকভাবে ক্লাসিকেও নাম

ালো হল 'আলিবাবা'। নৃপেন বসু আবদল্লার ভূমিকায় আর মর্জিনা ভূমিকাভিনেত্রী কুসুমকুমারী নাচে গানে মাতিয়ে দিলেন। এই দুই শিল্পীর দ্বৈত নাচ ও গান দর্শকদের তুমুল আনন্দ-উত্তেজনায় মাতিয়ে রেখেছিল। প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা টিকে থাকতে পারল না। বিত্রি কমতে কমতে নিলামে বিত্রি হয়ে গেল ১৮৯৮ সালের মার্চে। অন্যদিকে ক্লাসিকের বিত্রি বাড়তে থাকে। একটা টিকিটের জন্য দর্শকদের নধ্যে হাহাকার পড়ে যায়।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'ভ্রমর'এরমত সাফল্যপূর্ণ নাটক অতি বিরল। 'চুঁচুঁড়া বার্তবহ' পত্রিকায় একবার একটা সংবাদ বের হয়-"আমরা শুনিয়াছি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কোনো সময়ে বলিয়াছিলেন যে, আমার 'কৃষ্ণকান্ত' যদি 'ভ্রমর' নামে অভিনিত হয়, তহা হইলে আমার বড়ই সন্তোষের কারণ হয়।" (৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৬)। বঙ্কিমের ইচ্ছাকেই যেন অমরেন্দ্র বাস্তব রূপ দিলেন। ১৮৯৯ সালে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর নাট্যরূপ দিলেন 'ভ্রমর' নামে এবং ক্লাসিকে তা মঞ্চস্থ করেন। বস্তুত 'ভ্রমর'কে বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক যুগান্তকারী নাটক বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কেননা, সব বিষয়ে 'ভ্রমর' বঙ্গ রঙ্গালয়ে এক নবযুগ আনতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় 'ভ্রমর'-এর বিজ্ঞাপন বের হল এই ভাষায় "Gobindalal on horse back",হ্যাণ্ডবিলেও বড় বড় অক্ষরে ছপা হত 'অপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল'। গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথ ঘেড়ায় চেপে মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠত। যদিও মঞ্চে অপৃষ্ঠে অবতরণ অমরেন্দ্রনাথই প্রথম করেননি। তাঁর আগে শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ অনেক নাটকে অপৃষ্ঠে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। অমরেন্দ্রনাথ যে ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে আসতেন সেই ঘোড়ার মাথায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলত। এই নতুনত্ব দর্শককে অভিভূত করেছিল। 'সীতারাম' নাটকেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে ঢুকতেন। 'ভ্রমর' নাটকে বাণী পুষ্করিণী ও তার পল্লবতী নাটকের বাস্তবতায় তিনি চমক দিয়েছিলেন। পুষ্করিণীর জল, বৃক্ষশ্রেণী, উদ্যানবাটী, বাঁধানো ঘাট সব যেন সত্য বলে মনে হত। সার্ট ছিঁড়ে অমরেন্দ্রনাথ রোহিনীকে (প্রমদাসুন্দরী) উদ্ধার করার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন এবং রোহিনীকে নিয়ে যখন উঠতেন, তখন দুজনের কাপড় থেকে জল পড়ত। এ প্রসঙ্গে ডঃ দর্শন চৌধুরী 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন-"দর্শকদের চমক দেবার জন্য আজকের ভাষায় যাকে'গিমিক'বা'স্টান্ট' বলে, অমর দত্ত তার ব্যবহার মঞ্চে প্রায়ই করতেন। কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে ঢুকতেন। বাংলা মঞ্চে এটা নতুন নয়। অমর দত্তের স্টান্ট হল, তিনি ঘোড়ার মাথায় ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিলেন। জলমগ্না রোহিনীকে গোবিন্দলাল একেবারে জলসিক্ত অবস্থায় মঞ্চে তুলে আনলেন। জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের শব্দের সাথে জলও ছিটিয়ে পড়ত দর্শকদের মধ্যে। তাছাড়া, আকাশে উড়ে যাওয়া, ফোয়ারার জল, বিদ্যুৎচমক, রিভলবার পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার শব্দ, জীবন্ত পশুপাখি সবই তিনি অবলীলাক্রমে মঞ্চে দেখাতেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি নাট্য ব্যতিরিক্ত হত কিন্তু দর্শক তাতেই অকৃষ্ট হত বেশি।" (পৃঃ ১৯৬)। 'অপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল' শব্দ দুটি তো এখন বাংলা থিয়েটারর প্রবাদবাক্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসলে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর সব প্রযোজনাতেই কিছু না কিছু চমক সৃষ্টি করে দর্শকদের হকচকিয়ে দিতে ভালোবাসতেন। বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বজরা এবং বজরাতে ডাকাতির গুত্ব অনেকখানি। এই গুত্ব উপলব্ধি করে অমরেন্দ্রনাথ দেবীচৌধুরাণী অভিনয়ে বজরা এবং বজরাতে ডাকাতির দৃশ্য দেখাতেন। 'প্রতাপাদিত্য' নাটকেও তিনি নদীদৃশ্য এবং নদীর উপরে যুদ্ধদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রযোজনা পদ্ধতি প্রবন্ধে লিখেছেন—"কুলকুলনাদিনী নদীতে নৌকা তরঙ্গে দুলছে, অদূরে জাহাজ, নদীর একতটে প্রতাপের যুদ্ধ জাহাজ, অপরতটে মানসিংহের সৈন্যবাহিনী। প্রতাপাদিত্যের সৈন্যবাহিনী থেকে নিক্ষিপ্ত গোলায় হঠাৎ মানসিংহের শিবির দাউ দাউ করে জুলতে লাগল। এধরণের অত্যাশর্চ্য দৃশ্য ও নাট্যক্রিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম দেখা গেল। শেষ দৃশ্যে যশোস্বেরীর মন্দির ঘুরে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের মূর্ছিত হয়ে পড়া অপূর্ব নাট্য উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। নাট্য আকাদেমী পত্রিকা)। 'ইন্দিরা' অভিনয়ে চেতলা সেতু ও ড্রয়িং রূমের একটি দৃশ্য দেখিয়ে তিনি দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করে তোলেন। 'বিষবৃক্ষ' প্রযোজনায় দশাশ্বমেধ ঘাট, গঙ্গাবক্ষে বজরায় নগেন্দ্রনাথ, সারি সারি নৌকা, গঙ্গার ধারা তরতর করে বয়ে চলেছে ইত্যাদির দৃশ্যের বাস্তবতা দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।

পেশাদারি থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ধারাকেই তিনি আমূল পাল্‌টে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও তিনি 'গিমিক'বা স্টান্ট' দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষাকে যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। 'ভ্রমর' এর বিজ্ঞাপনের কথা আমরা আগেই বলেছি। 'নল দময়ন্তীর' বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন —"Splendid Lotus Scene — একটি ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।" হাতপাখার পিছনে, ঠোঙার ওপরে তাঁর থিয়েটারের বিজ্ঞাপন করতেন। তখন প্রেক্ষাগৃহে ইলেকট্রিক ছিল না, পাখা ছিল না। একপিঠে অমরেন্দ্রনাথের ছবি এবং অন্য পিঠে নাটকের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়ে পিচবোর্ডের পাখা দর্শকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হেয় করে এবং সগর্বে আত্মপ্রাধান্য ঘোষণা করে তিনি তরলমতি, কলহপ্রিয় দর্শদের উত্তেজিত করে তুলতেন। 'মিনার্ভায় সীতারাম নাটকে নাম ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অবতীর্ণ হতেন। অমরেন্দ্রনাথ ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্লাসিক-এ সীতারাম নামালেন। সদর্পে হ্যাণ্ডবিলে ঘোষণা করলেন গিরিশচন্দ্রকে কটাক্ষ করে- "ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে"। তাঁর সীতারাম অভিনয় দেখে উত্তেজিত দর্শকদের সেদিন মুখে মুখে ফিরতঃ-

"অপৃষ্ঠে সীতারাম"- কী অপূর্ব শোভা!
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ প্রতিভা!
নটগু সনে রণ,
দম্ভে করে আস্ফালন,
ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।"

দর্শক আকর্ষণের জন্য তিনি বিজ্ঞাপনে চির সীমাকেও লঙঘন করেছিলেন। ইন্দ্রিয় লালসাকে উস্কে দেবার জন্য তাঁর বিজ্ঞাপনের ভাষাও ছিল চিহীন, নীচ প্রবৃত্তি সম্মত। যেমন 'সারি সারি সখীর সারি', 'নাচে গানে ধুলো পরিমাণ', 'ষোড়শী যুবতীর যৌবনতরঙ্গে সন্তরণ' ইত্যাদি। চিটেগুড়ের প্রতি যেমন পিঁপড়ের দল ছুটে যায়, ঠিক তেমনি অমরেন্দ্রনাথের নাটক দেখার জন্য দল বেঁধে দর্শক ছুটত ক্লাসিকে। ক্লাসিকে তখন বৈদ্যুতিক আলো নেই, পাখা নেই, বসার জায়গা নেই, টিনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে, বসার জায়গায় এক হাঁটু জল তবু দর্শক ভিড়ে ক্লাসিক পরিপূর্ণ। 'থিয়েটারে বাদুর ঝোলা' বাক্যটির উদ্ভবই হল অমরেন্দ্রনাথের কল্যাণে। রমাপতি দত্ত তাঁর 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন - "দর্শক সেদিন বসিবার জন্য জায়গা চাহিত না, টিকিটের জন্য হাহাকার করিত। আসলে তখন অমরেন্দ্রনাথের নামে সারা বাংলাদেশ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল।" আমরা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলতে চাই— বাংলাদেশের দর্শকদের অমরেন্দ্রনাথ ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। তাদের ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য মুখরোচক মশলার জোগান দিয়েছিলেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়নই করেছেন— "অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটি সর্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন। থিয়েটার যেন বুরোক্রেসীর রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন।" ডেমোক্রাসির অর্থ হল দর্শক সাধারণ শিস্ দিয়ে, অসঙ্গত কুচিপূর্ণ ইয়ার্কি করে, নানা ইঙ্গিতপূর্ণ বোলচাল কেটে তৃপ্তি পেতে লাগল। উদ্বেলিত জনতরঙ্গের উল্লাসে তিনিও গর্বিত, আনন্দিত হলেন। একথা ঠিক, রঙ্গমঞ্চের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য তিনি অনেকিছুই করেছেন যার তুলনা নেই। যেমন অভিনেতা- অভিনেত্রী, নৃত্য-সংগীত শিক্ষক, বাজনাদার, শিফ্‌টার প্রমুখ সকলের মাইনে বাড়িয়ে দেয়া, নাট্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া, দর্শকদের বই উপহার দেওয়া ইত্যাদি। তথাপি আমরা বলব, রঙ্গালয়কে তিনি শিক্ষাগার করতে চাননি, আনন্দ-নিকেতনই করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং

সে কাজে তিনি একশভাগ সাফল্যও পেয়েছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের গিমিক-ম্যাজিক পরবর্তীকালের পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। দর্শক আকর্ষণের জন্য এবং তাদের সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনে চমক সৃষ্টি করা হত। দু একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেমন 'কোহিনূর থিয়েটার' এ 'ময়ূর সিংহাসন' নাটকের দশম রজনীর বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এরকম ঃ

"রঙ্গালয়ে অভিনব ব্যাপার!
রাজপথে জীবন্ত জিহনের জ্বলন্ত দেহ!
ভীষণ দৃশ্য! লোমহর্ষণ দৃশ্য !!

রঙ্গালয়ে সর্বজন সমক্ষে অকৃতজ্ঞ পিশাচতুল্য জীহন আলির সর্বাঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়া হইবে। দেখিতে দেখিতে জীবন্ত জীহন আলির দেহ পুড়িয়া ছাই হইবে। কেবন কঙ্কালমাত্র থাকিবে। মভূমির মধ্যে ঝটিকাবর্ত্তে নাদিরা! এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে।"

'স্টার'-এ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বারাণসী' নাটকের বিজ্ঞাপন ঃ

"রণোন্মত্ত দ্রমূর্তি মহাদেবের ত্রিশূল
হইতে ধক্ ধক্ অগ্নি নিঃসৃত হইয়া
কৌতুহলী দর্শকবৃন্দকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিবে।
এইরূপে বহুদৃশ্য বহুবিচিত্র চমকপ্রদ দৃশ্য দর্শন করিবেন।"

'রাণী দুর্গাবতী' নাটকের বিজ্ঞাপন করা হত এভাবে ঃ

"রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর! রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর!
রঙ্গমঞ্চে সর্বসমক্ষে একদৃশ্যে
একেবারে চারটি অশ্বারোহীর আবির্ভাব।"

এভাবে বিজ্ঞাপনের বিশেষ পরিকাঠামোর বিন্যাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নাটক দেখার জন্য দর্শকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে তোলা হত।

বিজ্ঞাপনের মত থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জা ও নাট্যক্রিয়ার মধ্যেও অমরেন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল। 'গিমিক' বা 'স্টান্ট' দিতেই আগ্রহ দেখালেন নাট্য প্রযোজক ও মঞ্চাধ্যক্ষরা। স্বাধীনতা উত্তর পেশাদারি থিয়েটারও এ রোগ থেকে মুক্ত হল না। নাটক জমিয়ে দিতে হবে! জমিয়ে দেবার খেলায় মেতে উঠে তারা দর্শকের চোখ ধাঁধানোর নেশায় মত্ত হয়ে গেল। শচীন সেনগুপ্তের 'বাংলার প্রতাপ' নাটকটি 'রঙমহল' -এ মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। এ নাটকের দৃশ্যপট পরিকল্পনার মধ্যে বেশ গিমিক ছিল। নদীর ধারে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। মনরাজরূপী রবি রায় বন্দুকের গুলিতে পায়ে আঘাত লেগে পড়ে আছে। পাছে বিপক্ষ দল মনরাজকে ধরে ফেলে তাই কার্ভালো -বেশী অহীন্দ্র চৌধুরী রবি রায়কে মঞ্চের মাঝখান থেকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। এই দৃশ্যের আলোর চমৎকারীত্বে এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ত। কালিকা থিয়েটার-এ রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে লেখা যুগদেবতা (১৯৪৮) মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে বৃষ্টি, কালিকা মূর্তির অঙ্গ থেকে জ্যোতিবিকিরণ ইত্যাদি বহু ট্রিক বা বিশেষ অলৌকিক কলাকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন নানুবাবু(মণীন্দ্র দাস)। এই থিয়েটারেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৫১ সালে। এ নাটকের শেষ দৃশ্য দর্শককে বিস্ময় বিহ্বল করে তুলত যেখানে পদ্ম চোরাবালির চরে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু মঞ্চের কলাকৌশলই শুধুমাত্র যে নাটকের সাফল্য এনেদিতে পারে না তার বড় প্রমাণ আলোচ্য নাটকটি। দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপে 'শ্রীকান্ত' (১ম ও ২য় খণ্ড) 'স্টার'-এ মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৭ সালে। ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানের সময় জলের ওপর নৌকা চালানো দেখানো হত। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে নিশুতি রাতে কুকুরের ডাক শুনে ভয়ে যেখানে নতুনদা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ইন্দ্র তাকে উদ্ধার করে জল থেকে তুলে আনছে, সেখানে জল ছিটকে যাবার দৃশ্য দেখানো হত। শুধু তাই নয়, ইন্দ্র ও নতুনদা দুজনেই জলসিক্ত অবস্থায় মঞ্চে উঠে আসত। স্বাভাবিক কারণেই অমরেন্দ্রনাথের 'ভ্রমর' নাটকে বাণী পুষ্করিণী থেকে গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিনীর উদ্ধারের দৃশ্য মনে পড়ে যায়। তাছাড়া কুমারবাহাদুরের ক্যাম্পের দৃশ্যটি ট্রলির সাহায্যে দেখানো হত। শাহুজীর কুঁড়েঘরে জ্যান্ত সাপ দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হত। সে সময়ে প্রেক্ষাগৃহে হৈ হুল্লোড় পড়ে যেত। নরেশ মিত্রে পরিচালনায় 'সেতু' মঞ্চস্থ হয় বিশ্বরূপায় (১৯৫৯)। প্রয়োগের দিক থেকে এ নাটকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ নাটকেও গিমিক ছিল। রেল ইঞ্জিনের হেড লাইটের আলো এমনভাবে ফেলা হত যা দেখে মনে হত যেন প্রেক্ষাগৃহের ওপর দিয়ে ট্রেনটি চলে যাচ্ছে। 'ডাক বাংলো নাটকে তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জাদুকর পি.সি.সরকারের সাহায্যে ম্যাজিকই দেখানো হত। এ নাটকে ছবি বিশ্বাস দীর্ঘ নয় বছর পর আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বেরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। রাতে বিশ্বের যখন গভীর ঘুমে মগ্ন তখন তার ঘরে টাঙিয়ে রাখা বাবার ছবি সহসা কথা বলতে শু করত। শুধুমাত্র এ দৃশ্যটি দেখার জন্যই দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে গিমিক দেবার যে কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শু করেছিলেন, পরবর্তীকালের পেশাদারি থিয়েটার তাকে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলে। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রযোজনায় গিমিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রযোজনায় সত্যিকারের ফুলের বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছে

"ফাল্গুনীতে ....স্টেজের উপর তৈরি হোল প্রায় একটা আস্ত বাগান— গাছে ফুল ফুটে আছে, গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে দোলনা।"

গণনাট্যের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল যে গ্রুপ থিয়েটার তাতে রাজনীতির ভূমিকা ছিল বিশাল ও প্রত্যক্ষ। এই থিয়েটার পেশাদারি থিয়েটারের মত শুধু প্রমোদের জন্য নয় ; দর্শকের চেতনা ও মননকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব নিল। নবান্ন (১৯৪৪) প্রযোজনার মধ্য দিয়েই এই থিয়েটারের যাত্রা শু হল। থিয়েটার এক নতুন বাঁক বা মোড় নিল। নবান্ন পেশাদারি মঞ্চ শ্রীরঙ্গম-এ (বর্তমান বিশ্বরূপা) মঞ্চস্থ হয়। পেশাদারি মঞ্চের দীপ্তি তখন প্রায় স্তিমিত। তথাপি নিয়মিত অভিনয় করে যাচ্ছেন শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, ছবি বিশ্বাস, তিনকড়ি চক্রবর্তী, সরযূবালা দেবী, রাণীবালা, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখরা। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেন তিন প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব। যথা শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীক্ষেত্রে দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। যদিও একটা বিতর্ক তাঁদের মধ্যে ছিল। একদল যাঁরা নবনাট্য শব্দটা ব্যবহারের পক্ষপাতি তাঁরা মনে করলেন , রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রচারে লিপ্ত হলেথিয়েটার আর শিল্প থাকে না। অন্যরা নিজেদের এজিটেটর, প্রোপাগ্যান্ডিস্ট বলে দাবী করলেন। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করাই তাঁদের নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতে শিল্প হল কি হল না— এ নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যাথা নেই। বস্তুত ষাট এবং সত্তরের দশকের পুরোটা জুড়ে এই বিতর্ক চলতে থাকে। আশির দশক জুড়ে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নববই-এর দশকেতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। সেটা হল রাজনৈতিক থিয়েটারের ক্ষীয়মানতা। ফলে গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে তথাকথিত জনপ্রিয়তা অর্জনের সুবিধাবাদী ঝোঁক। কাউন্টার কাঁপাতে গিয়ে বেশ কিছু দল গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ ও লক্ষ্য বিচ্যুত হচ্ছে। হাতিবাগানের মঞ্চগুলির 'একে একে নিভিছে দেউটি'। এখনকার থিয়েটারের দর্শকের এক বিরাট অংশ আজ গ্রুপ থিয়েটারমুখী। তাঁদেরকথা মাথায়রেখেই কি গ্রুপ থিয়েটারের সস্তা তরল,

মুখরোচক জিনিসের আমদানি? নাটক জমিয়ে দেবার খেলায়,দর্শককে চমকাবার নেশায় মশগুল কিছু কিছু নাট্যদল ও নাট্য পরিচালক। এ খেলা কি নিরন্তর চলবে? নাকি থিয়েটার ঘুরে দাঁড়াবে আপন গতিতে। উত্তর দেবে আগামী কাল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com